যুগান্তর

17 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরা ক'জন

মুজিবুর রহমান

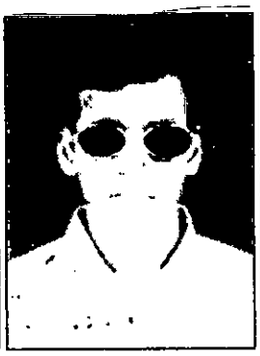

মাধব চন্দ্র পাল

পারভীন বেগম

কবির হোসেন

শত বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। দুরন্ত-দুর্বার গতিতে। কোন বাধাই ওদের আটকে রাখতে পারেনি। নানারকম প্রতিবন্ধকতা পাশ কাটিয়ে প্রাথমিক, সেখান থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে শেষ পর্যন্ত কলেজের গণ্ডিও পেরিয়ে এসেছে। প্রতিযোগিতার এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়ও পদচারণা ঘটছে ওদের। অন্ধ ওরা। ওদের সামনে আছে বিশ্ববিখ্যাত হোমার আর হেলেন কেলারের দৃষ্টান্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের মতো প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাচ্ছে অন্যান্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে। বিচরণ করছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। তদুপরি এখানেও ওদের রয়েছে নানা সমস্যা।

কথা হচ্ছিল ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাধব চন্দ্র পালের সঙ্গে। বললেন, মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে আমার চোখ আক্রান্ত হয়েছিল টাইফয়েডে। ডাক্তার চেয়েছিলেন অস্ত্রোপচার করতে, কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা আমাকে বাধ্য করেছিল মূর্তিপূজক এক কবিরাজের কাছে যেতে। কবিরাজ মূর্তির মাটি বেটে চোখে লাগানোর উপদেশ দিয়েছিল। আর সে উপদেশ শুনে আজ আমি অন্ধ।

খানিকটা আক্ষেপের সুরে বললেন, স্কুল-কলেজে পড়াকালীন সবাই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, এগিয়ে এসেছিল মেয়েরাও। কেউই আমাদের উপেক্ষা করেনি। ভেবেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হবে আরও উদার। ওদের সঙ্গ পেয়ে থাকবে না আমাদের অন্ধত্বের ব্যথা। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ভিন্ন বাস্তবতা, এটা আমাকে দারুণভাবে দুঃখ দেয়।

সমস্যার কথা জানাতে গিয়ে তৃতীয় বর্ষের পারভীন বেগম অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াটা অনেকটা কষ্টের বলে জানালেন। বললেন– বেশ ব্যয়বহুলও। তিনি বললেন, আমরা স্যারদের লেকচার রেকর্ড করি। অনেক সময় সেলফ সিকরেসির কারণে নিষেধ করা হয় রেকর্ড করতে। ফলে লেকচারটা সংগ্রহের জন্য বা অন্য কোন নোটপত্রের জন্য ছুটে যেতে হয় অন্য বন্ধু-আন্ধবদের কাছে। তারপর সেগুলো আরেকজনকে দিয়ে পড়িয়ে লিখতে হয় ব্রেইল (অন্ধদের জন্য বিশেষভাবে লেখা) পদ্ধতিতে। এগুলো করতে করতে আমাদেরকে ব্যয় করতে হয় একজন সাধারণ ছাত্রের দ্বিগুণ সময়। চলে আসে পরীক্ষা, সুতরাং সম্ভব হয় না ভাল রেজাল্ট করা। অনেক সময় বন্ধুরাও ভাল নোটপত্র দিতে চায় না বলে অভিযোগ করলেন তিনি।

একই বর্ষের কবির হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি সাধারণ ছাত্র এবং অন্ধদের মধ্যকার বৈষম্যকে তুলে ধরলেন বিশেষভাবে। তিনি বললেন, সাধারণ ছাত্ররা লাইব্রেরিতে যেতে পারে। পারে জ্ঞানের অদম্য স্পৃহাকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু আমরা যারা অন্ধ তাদের জন্য সেখানে নেই কোন ব্রেইল প্রিন্ট বই। তিনি জানালেন, হলে সিট পেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়। বাইরে থেকে আসাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অন্ধদের ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে হলে সিটের ব্যবস্থা করে দিলে উপকারে আসত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনার কথা জানতে চাইলে বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে কিছুটা ভেজা কণ্ঠে বললেন, একদিন ক্লাস শেষে কলাভবন থেকে হলে যাওয়ার সময় রাস্তায় ঘুমন্ত এক কুকুরের গায়ের ওপর উঠে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে পাশে থাকা বেশ কয়েকজন মেয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। আর কুকুরের কামড়ে আমার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। বুঝলাম ওরা আমাকে নিয়ে উপহাস করছে। কিন্তু আরেক ছাত্র ভাই আমাকে নিয়ে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এ ঘটনা বলতে বলতে অন্ধদের সঙ্গে গাইড দেয়ার দাবি জানালেন তিনি।

আমরা কারও করুণা চাই না। আমরা চাই মানুষের ভালবাসা। মানুষের কাছ থেকে আমাদের যে সাহায্যটা চেয়ে নিতে হয়, তাদের উচিত সেটা এগিয়ে এসে করা। কথাগুলো বলছিলেন মাস্টার্সের ছাত্র সূর্যসেন হলের মুজিবুর রহমান। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত। রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, অন্ধরা কেন রাজনীতি করবে না। অন্ধদের বিচরণ থাকবে সর্বক্ষেত্রে। তিনি অনেকটা ঢাবি'র অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে বেশ সোচ্চার তিনি। ১৯৯৮ সাল থেকে অন্ধদের বার্ষিক উপবৃত্তি হিসাবে দেয়া অনার্সে ১৮০০ এবং মাস্টার্সে ২৪০০ টাকাকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল উল্লেখ করে তা বাড়ানোর কথা বললেন তিনি। সত্যি সত্যি যে কেউ ক্যাম্পাসে এলে দেখতে পাবেন এদের বিচিত্র বিচরণ। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একাই সারা ক্যাম্পাস ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুঁজে নিচ্ছেন তাদের ক্লাসরুম, থাকার রুমসহ প্রয়োজনীয় সব জায়গা। খেলছেন দাবা, দিচ্ছেন আড্ডা, গাইছেন গান।

আলাপকালে এদের অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন তাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র নিয়ে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সরকারি পদক্ষেপের ব্যাপারে। আসলে সরকার, সমাজের বিত্তবানসহ সর্বস্তরের লোকেরই উচিত এদের বিশেষভাবে বিবেচনা এবং উপযুক্ত আসনে আসীন করে লেখাপড়ার প্রতি আরও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

❑ মুজাহিদুল ইসলাম জুয়েল